খসড়া

প্রান্তজনের আপনজন
ও
নেপথ্যে নায়ক

অধ্যাপক আবদুল বায়েস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এক

সাদা চোখে 'নায়ক' মানে রূপালি পর্দার সুদর্শন ও সুশীল যুবক যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং মুক্তির পথ দেখায়। মানুষকে স্বপ্ন দেখাবার জন্য রাজনীতির মঞ্চেও নায়কের আবির্ভাব ঘটে থাকে। আবার, টানটান টেনশনের খেলায় যে দল জেতায়, নায়কের মুকুট তারই। কিন্তু মনে রাখা দরকার, রাজনীতি, মঞ্চ আর ময়দানের বাইরেও নায়ক থাকে। কাজ করে অনেকটা নীরবে, নিভৃতে; কখনো প্রান্তজনের আপনজন, কখনো দরিদ্রের দিশারি কিংবা দারিদ্র্য বিমোচনের কারিগর হিসাবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে থাকে। তার করোটিতে সারাক্ষণ অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের কথা খেলে যায়; নারী ও শিশুর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সে আপোষহীন যোদ্ধা। সুতরাং, নায়ক তাকে বলতেই হয়।

দুই

এমন একজন স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি। বিশ্বনন্দিত এনজিও ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন – ব্র্যাক পরিবারের 'আবেদ ভাই'। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচন তথা দরিদ্রের ক্ষমতায়নে কৃতিত্ব স্বরূপ ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ক'বছর আগে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে। জানা যায়, প্রায় ১০০ বছর পূর্বে – সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট প্রাপ্তির দু'বছর আগে – তাঁর পরিবারের অন্য কেউ স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। তাছাড়া, আত্মীয়-স্বজনের কেউ আবার অবিভক্ত বাংলার প্রশাসনের প্রভাবশালী পদেও ছিলেন।

তিন

১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে এমন একটা শিক্ষিত, স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন ফজলে হাসান আবেদ। মা সাইয়েদা সুফিয়া খাতুন ও বাবা সিদ্দিক হাসান। ছোটবেলা থেকে তুখোড় ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন আবেদ পাবনা জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পাশ করে মাত্র ১৮ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন করেন। ১৯৫৪ সালের কথা – গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথমেই সবাইকে চমক দিলেন: জনপ্রিয় বিষয় ছেড়ে তিনি অজানা-অচেনা নেভেল আর্কিটেকচারে ভর্তি হলেন। শুনে তো সবার চোখ ছানাবড়া – 'এ আবার কোন বিষয়'? আমাদের মনে হয় এটা ছিল একটা ইংগিত মাত্র যে প্রথাগত পথ ও পদ্ধতি তাঁর ধাত নয়। যাই হোক, অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও পড়াশুনা শেষে দেশে ফিরে বিশ্ববিখ্যাত বহুজাতিক শেল ওয়েল কোম্পানির চাকরিতে যোগ দেন। মোটা বেতন, পয়মন্ত জীবনযাপন ও ধোপদুরস্ত চালচলন ইত্যাদি কারণে অনেকের কাছে এই চাকরি সোনার হরিণ; কারও কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। সময় গড়িয়ে গেলে এবং সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পুরস্কারস্বরূপ খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কোম্পানির হেড অফ ফিনান্সের পদটিও পেয়ে যান। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই সময় ফজলে হাসান আবেদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন এবং ভাগ্যরেখা উর্দ্ধমুখী ছিল – একদিকে এ্যডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাত'-এর হাতছানি, অপরদিকে ক্যারিয়ারের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ। এমন সুযোগ হাতছাড়া করার মানুষ পৃথিবীতে নেই বললেও চলে। তাই কেউ কেউ ধারণা করল, ফজলে হাসান আবেদ বুঝিবা কোম্পানীর 'বড় সাহেব' হতে চলেছেন; আবার কারও কারও মাঝে সন্দেহ দেখা দিল, সেক্ষেত্রে মাটিতে পা পড়বে তো?

চার

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বাস্তবে হয় অন্যকিছু। সময়ের আবর্তনে কোম্পানির 'সাহেব' থাকার চেয়ে তিনি দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের তথা সমাজের 'সেবক' হবার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। আর তাঁর পা শুধু মাটিতেই পড়ল না, এমনকি দুর্গম অঞ্চলে গরিবের ডেরায় সশরীরে উপস্থিত তিনি। তাঁর জীবনের এই 'ইউ-টার্ন-এর ব্যাখ্যা বহুবার তিনি নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, সত্তরের ভয়াবহ জলোচ্ছাস ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আশৈশব আদ্যন্ত মানবতার পুঁজারি ফজলে হাসান

আবেদ এমনিতেই তৎকালীন বৈষম্যমূলক ও দারিদ্র্যপীড়িত পাশবিক ও স্বল্পায়ুর সমাজ নিয়ে বেদনাহত ও কিছুটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তার ও পর সত্তরের জলোচ্ছাসে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ মানুষের আকাশভাঙ্গা আহাজারিতে বিচলিত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজে জড়িয়ে দেখেছেন মানুষ কত অসহায় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র কত নির্বিকার ও নির্মম হতে পারে। এর খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ তরুণ সমাজের করোটিতে মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারার বিখ্যাত উক্তি: A revolution is not an apple that falls when it is ripe. You must make it fall। একদিন লালগালিচা চাকরি ও বিলাসি জীবন পেছনে ফেলে অঘটনঘটন-পটিয়সী প্রতিভা ফজলে হাসান আবেদ ছুটে গেলেন মুক্তিযুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধ শেষে বহুজাতিক কোম্পানির 'বুর্জোয়া জীবন' ছেড়ে, অনেকটা 'মার্কসীয়' ধারায় মানবসেবায় জড়িয়ে পড়লেন।

পাঁচ

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক দস্তায়ভস্কির মতে, মানুষের জীবনের গুঢ় রহস্য শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে নিহিত নয়; নিহিত কোনো কিছুর জন্য বেঁচে থাকার মধ্যে। সময়ের পরিক্রমায় ফজলে হাসান আবেদ প্রমাণ করলেন যে, অন্তত তাঁর কাছে, এই 'কোনো কিছুর জন্য' হচ্ছে দরিদ্রের জন্য, হরিজনের জন্য এবং মোটা দাগে অসহায় মানুষের জন্য। কথাই তো আছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', 'মানুষ ধর মানুষ ভজ শোন বলিরে মন আমার'। মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবার লক্ষে ১৯৭২ সালে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করলেন এবং প্রান্তজনের পাশে দাঁড়াবার জন্য এতটাই বেপরোয়া ও ব্যপৃত হয়ে পড়েছিলেন যে, লন্ডনের নিজের ফ্ল্যাটটি পর্যন্ত বিক্রি করে ব্র্যাকের অর্থের যোগান দিয়েছিলেন। আমরা জানি, রিলিফ ও পুনর্বাসন কাজ দিয়ে ব্র্যাকের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয় সুনামগঞ্জের শাল্লা থেকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সেজন্যেই ডেনমার্কের যুবরাজ ছাড়া যেমন হেমলেট নাটক কল্পনা করা যায় না, তেমনি শাল্লার প্রসঙ্গ ছাড়া আবেদ ভাই তথা ব্র্যাকের বৃত্তান্তও পূর্ণ হয় না। শাল্লা হচ্ছে বাংলাদেশের অত্যন্ত দুর্গম, অনুন্নত ও দরিদ্র-পীড়িত, এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু অধ্যুষিত একটা এলাকা। শোনা কথা, সেই আমলে ঢাকা থেকে ট্রেনে সিলেট, সিলেট থেকে ৩-৪ ঘন্টার বাসে শেরপুর; শেরপুর থেকে ১০-১২ ঘন্টা লঞ্চে দিরাই এবং দিরাই থেকে ৫-৭ ঘন্টায় পায়ে হেঁটে বা নৌকায় শাল্লা যেতে হত। সেখানকার মানুষগুলো পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল এবং ফিরে

আসার পর তাদের রিলিফ ও পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত হয় ব্র্যাক। দিরাইতে একটা ছোট অফিসে ৫জন কর্মচারি নিয়ে কাজ-কর্ম শুরু আর অফিস বলতে দু'টো ভাংগা চেয়ার, টেবিল এবং কুপির আলোতে পরিত্যাক্ত কোনো দোকান, গোয়ালঘর কিংবা হাসপাতালের ভাঙ্গাচোরা কক্ষ। ক্ষেতের আইল ধরে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন বহুজাতিক কোম্পানির এক সময়ের হেড অফ ফিনান্স ফজলে হাসান আবেদ। মাঝেমধ্যে ক্লান্তিকালে মাচায় শুয়ে গা এলিয়ে দিতেন, কখনো-সখনো চলত মরিচ ও পেঁয়াজে পান্তাভাত। আর ঠোঁটের কোনায় লেগে থাকত একটার পর একটা খুব কমদামী চারমিনার বা স্টার সিগারেট। আবেদ ভাইয়ের সেই দিনের এই 'ডি-ক্লাশড' জীবন যেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আর্ট ফিল্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবে, শাল্লার অভিজ্ঞতা শুধু যে কষ্টের ছিল তা নয়, ছিল শিক্ষণীয়ও। প্রথম শিক্ষাটি তো অবশ্যি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা উক্তির সাথে যায় বলে মনে হয়; 'মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা নিতে পারে তা এই নয় যে এই পৃথিবীতে প্রচুর দুঃখ ও বেদনা আছে; শিক্ষা হলো সেই দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করা তার পক্ষে সম্ভব।' দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে, দারিদ্র্য শুধু আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যাপার নয় – শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় সুযোগও বড় জিনিষ। তৃতীয়, রিলিফ কখনো রক্ষাকবচ হতে পারে না – দরিদ্র্যের টেকসই উন্নতির জন্য আয়-বর্ধন জরুরি। সবশেষে, শাল্লা বোধ করি এখনো উন্নয়নকর্মীদের জন্য 'এ টেস্ট কেইস অফ ডেভেলপমেন্ট' কেননা, এমন দুর্গম এলাকায় সফল হওয়া মানে বাংলাদেশের যে কোনো এলাকায় সফল হওয়া।

ছয়

মনিষি হেলেন কেলার বলেছেন, প্রায় সব মানুষের মধ্যে দৃষ্টি থাকলেও খুব কম লোকের মধ্যে দূরদৃষ্টি থাকে। এই খুব কম লোকদের একজন হলেন স্যার আবেদ। ডঃ এমএস সোয়ামিনাথান, যিনি ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং ১৯৮৭ সালে প্রথম বিশ্বখাদ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন, মনে করেন যে স্যার আবেদ হচ্ছেন Strategic thinker with future vision.। সত্যি তিনি একাধারে একজন ভবিষ্যত দ্রষ্টা, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের সুনিপুণ কারিগর যিনি মানুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন আবার মানুষকে নিয়েই স্বপ্ন

বাস্তবায়নে এগিয়েছেন। আর তাই তো আজ তাঁর বলিষ্ট নেতৃত্বে শুধু বাংলাদেশে নয়, সাড়া বিশ্বের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অভাবনীয় প্রভাব ফেলেছে ব্র্যাক।

বাংলাদেশের কথাই একটু বলি। আমরা মনে করি, বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ যে একটা উন্নয়ন ধাঁধাঁ বলে বিবেচিত, তা সৃষ্টিতে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল স্যার আবেদের চিন্তা-ভাবনা ও ব্র্যাকের কার্যক্রম যেমন: সত্তরের দশকে এক চিমটি লবণ, আধা লিটার পানি ও একমুঠো গুড় শ্লোগান নিয়ে সাড়া জাগানো ওর‍্যাল স্যালাইন বিপ্লব কলেরা ও ডায়েরিয়া থেকে বাঁচতে শিখিয়েছে; আশির দশকে শিশুর টীকা নিয়ে শিশুমৃত্যু রোধে বিস্তৃত অঞ্চলে সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাকের কাজ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে; নব্বই-এর দশকে কৃষি ও খাদ্য খাতে বীজ বিপ্লবের পথ ধরে এসেছে খাদ্য নিরাপত্তা ও বিশ্বখাদ্য পুরস্কার; এবং ২০০০ ও পরবর্তী সময়ে এবং অনেকটা রূপকথার মতো, অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, হত-দরিদ্র কর্মসূচি, গরিবের জন্য আইনি সহায়তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করার জন্য 'ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠাও বিপ্লবের অংশ।

সাত

স্যার ফজলে হাসান আবেদ এমন এক ব্যক্তি যিনি সারাক্ষণ দেশ ও সমাজের উন্নয়ন চিন্তায় মগ্ন থাকেন বিশেষত তাঁর চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে নারী ও শিশু। তবে লক্ষ করা গেছে, এই চিন্তা-চেতনা অনেকটা বহতা নদীর মতো – কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে নি। নতুন নতুন বাঁক ধরে ব্র্যাক চলেছে নতুন কৌশলে এবং একজন দক্ষ চালক বা নাবিক যা করে ঠিক তা-ই করেছেন ফজলে হাসান আবেদ। এই অর্থে তিনি রূপান্তরেরও নায়ক। একটা নির্দ্দিষ্ট উদাহরণ দেয়া যাক। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে তাঁর ধারণা হয়েছিল এনজিওগুলোর বিদেশি অর্থায়নে নিয়ন্ত্রণ নেমে আসতে পারে; সুতরাং টেকসই হতে হলে ব্র্যাককে অর্থায়নে স্বয়ম্ভর হতে হবে। যেই চিন্তা সেই কাজ। জন্ম নিল প্রিন্টিং প্রেস, মাইক্রোফিনান্স, পোলট্রি, আড়ং, ডেইরি ইত্যাদি মুনাফামুখী সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ। ক্ষুদ্র ঋণের বাইরে থাকা ১০ শতাংশ জনগণ ও 'হারিয়ে যাওয়া' মধ্যম উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হল ব্র্যাক ব্যাংক। উন্নত মানের উচ্চ শিক্ষার জন্য গড়ে উঠল বিশ্বমানের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শিক্ষা, উন্নয়ন ও সুশাসনের উপর পাঠদান

ও গবেষণা করা হয়। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে রূপান্তরের পথ বেয়ে ব্র্যাক আজ পৃথিবীর হাতে গোণা কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম যার বার্ষিক বাজেট ১ বিলিয়ন ডলারের ওপর (১০ হাজার কোটি টাকা) এবং যার ৭০-৭৫% উৎসারিত হয় নিজের তহবিল থেকে।

আট

তিনি একজন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ যিনি যুক্তিতে মুক্তি খুঁজে পান। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় গবেষণা ও মূল্যায়ন। এমনি চিন্তা থেকে সহকর্মী আহম্মেদ মুশতাক রাজা চৌধুরীকে নিয়ে ব্র্যাকের সূচনাতেই ১৯৭৫ সালে গড়ে তুলেছিলেন চিন্তার সূতিকাগার বলে কথিত গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ (আরইডি)। গেল চারদশকব্যাপী ব্র্যাকের ঈর্ষণীয় সফলতার পেছনেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং তদারকি। শুধু কি তাই? জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে ব্র্যাকের ফিনান্স, অডিট ও মনিটরিং বিভাগ দক্ষ লোকবল দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে পৃথিবীর যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকারের জন্য তা উদাহরণ হয়ে থাকতে পারে।

নয়

গরিব জনগোষ্ঠীর সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময়ে নামী-দামী প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার পেয়েছেন আমাদের এই নীরব নায়ক; প্রাপ্ত হয়েছেন টপ গ্রেড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক ডিগ্রী। এই তো সেদিন খাদ্য ও কৃষির নোবেল পুরস্কার হিসাবে গণ্য ২০১৫ বিশ্বখাদ্য পুরস্কার গ্রহণ করে সেটা উৎসর্গ করলেন দরিদ্র নারী সমাজকে। ২০০৪ সালে ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন পুরস্কার দেয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের প্রধান বলেছিলেনঃ "প্রথমে আমরা পুরস্কারটি দিয়েছিলাম ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে যিনি তার দেশে অনেক মানব উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। দ্বিতীয়বারে যখন পুরস্কারের জন্য বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের তথ্য ঘাটছিলাম, আমরা লক্ষ করলাম তাঁদের তুলনায় ব্র্যাক-এর ফজলে হাসান আবেদ অনেক বেশি কাজ করেছিল। সুতরায় সিদ্ধান্ত নিলাম পুরস্কারটি দেশের প্রেসিডেন্টকে না দিয়ে মানুষের প্রেসিডেন্টকে দেব" (অনুবাদকৃত)।

দশ

বিনয়ী, মিতভাষী, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, শিল্প ও সাহিত্য অনুরাগী এবং কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রান্তজনের আপনজন তথা 'নায়ক' হয়ে ওঠা স্যার ফজলে হাসান আবেদের ৮০তম জন্মদিনে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। তাঁর জীবন দীর্ঘ ও উৎপাদনক্ষম হোক। জনাথন সুইফট-এর ভাষায়, আপনি যেন জীবনের সকল দিন বেঁচে থাকেন এই কামনাই করি। তা না হলে কী করে বুঝব, Man can be destroyed but not defeated, কী করে পূরণ হবে আপনার অতৃপ্ত বাসনা নারী-পুরুষ সমতা? 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।'